স্মৃতির কাহিনি

রমেন সরকার

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

সূচিপত্র

হিদে	১
ভোরের আলো	৪
মাতৃত্ব	৮
কম্পাশিয়নেট গ্রাউন্ড	১০
শ্রাদ্ধ	১৩
শহীদ ভবন	১৭
অমলের সংসার	২১
প্রণতি	২৫
সু-জয়	৩১
ফল্গু/	৩৬
শেষ জন্ম	৪২
শ্রীক্ষেত্র দর্শন	৪৬
পেলিকান	৫১
টিয়া-পাখি	৫৬

শুভেচ্ছা বাণী

আমাদের শহরের প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক ও একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী হিসাবে শ্রীমান রমেন সরকারকে বহুদিন থেকে ব্যক্তিগতভাবে জানি। তার স্ত্রী অর্চনা আমার প্রাক্তন ছাত্রী তাই স্নেহভাজন। স্থানীয় একটি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে অর্চনা যোগ্যতার সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য পালন করে সুনাম অর্জন করেছে। রমেন নিজেও আমার ছাত্রপ্রতিম। তাদের দুজনের মিলিত উদ্যমে শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতির নানা পরিপোষণে আমরা গর্বিত।

সম্প্রতি রমেন তার লেখা বেশ কিছু গল্পের এক মুদ্রিত সংকলন আমাকে পড়তে দিয়েছিল, যা অচিরে বই আকারে বেরোবে। তার ইচ্ছা যে বইটির সূচিমুখে আমার একটি শুভেচ্ছালিপি থাকে। সেই জন্যই এই লেখনী ধারণ। রমেন তার জীবনের বেড়ে -ওঠার পর্বে ছিল ভাতজাংলা গ্রামের বাসিন্দা এবং এখনও সেখানকার সঙ্গে সবরকম কাজে কর্তব্যে ভালোবাসায় জড়িয়ে আছে। তার গল্পে সেই চমকপ্রদ গ্রাম যাপনের নানা অনুষঙ্গ লেখাগুলিকে সমৃদ্ধ ও জীবনরসে জায়মান করে তুলেছে। তার জীবনজীবিকা যেহেতু চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে জড়িত তাই অনেক গল্প গড়ে উঠেছে সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা আশ্রয় করে। ফলে গড়পড়তা যে সব গল্প আমরা পড়ে থাকি তার থেকে এই লেখকের বিষয়গত পার্থক্য বেশ উপভোগ্য মনে হয়েছে। নানা অজানা তথ্যে ও ঘটনায় গল্পের কাহিনিভাগ মনোরম হয়ে উঠেছে। এর বাইরেও বেশ কটি কাহিনি জমে উঠেছে, যাতে ব্যক্তি, সমাজ আর জীবনের প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট।

বইটি লেখার জন্য লেখককে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাব এই জন্যে যে, চিকিৎসকের ব্যস্ত ও গুরুদায়িত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলে তার ফাঁকে কাহিনিগুলিকে খুঁজে পেয়েছে সে। এই খোঁজার মন আর দেখার চোখ তো সকলের থাকে না। তারা গতানুগতিক জীবন কাটিয়ে চলে তার মধ্যে না আছে শ্রী বা না আছে গভীরতা। গড়পড়তা মানুষ জীবনধারণ করে থাকে, কিন্তু করতে হবে জীবনযাপন। এই যাপনের মূলে থাকে জানবার ক্ষুধা, শিল্পের বোধ ও সংস্কৃতির পাঠ। রমেনের মধ্যে সেই দুলর্ভ মনের ও যাপনের অভিজ্ঞান পেয়েছি বলেই সামান্য কটি অক্ষর সাজিয়ে তাকে স্নেহ ও শুভেচ্ছা জানাই। তার সারস্বত সাধনা সফল হোক।

সুধীর চক্রবর্তী

হিদে

বড়োদের কাছে সে ছিল হিঁদে আর ছোটোদের হিদেদা। ছোটো বড়ো সবার সমান প্রিয়। খুব ছোটোবেলাতেই হারিয়ে ফেলেছিল সেই পোশাকি নামটা হৃদয়ানন্দ। গ্রামে এটাই রীতি। আসল নামটা কেটে ছোটো ছোটো করে নেওয়া। তাই হৃদয়ানন্দ-হৃদে মুখে মুখে হিদে। সত্যানন্দ বাবুর তিন ছেলে আকুলানন্দ, হৃদয়ানন্দ আর চিদানন্দ। ছয় মেয়ে। ছোটোবেলায় নয় ভাই বোন মোটামুটি পাড়া মাতিয়ে রাখলেও টিকে গেল ঐ মেজো হিদে। অনেক লেখাপড়া শিখে আকুলানন্দ ভালো চাকরি নিয়ে কোথায় যে থিতু হল গৌহাটি না বাঙ্গালোর তার খোঁজ পাড়ার লোক দূরে থাক বাড়ির লোকই আর জানত না। আর ছোটোটি শরীর চর্চা আর খেলাধূলা নিয়ে থেকে মিলিটারিতে গেল। সেও ছুটি ছাটায় নিজের বাড়ি আসার বদলে শ্বশুর বাড়ি আসাই বেশি পছন্দ করত, ছয় বোনেরও বিয়ে হল— পটাপট। আবার জনা-তিনেক ফিরেও এল বাড়িতে কেউ স্বামী হারিয়ে, কেউ বেকার স্বামী নিয়ে—সবারই সাহারা হিদে। অথচ হিদে না শিখেছে সে রকম লেখাপড়া, না হয়েছে শারীরিকভাবে শক্তিমান, তবুও সেই সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু কি পাড়াতে কি বাড়িতে এবং সেটার শুরু সেই ছোটোবেলা থেকেই।

সত্যানন্দবাবুরা খুব গরিব হলেও নিজ গুণে পাড়ায় খুব জনপ্রিয় ছিলেন। গ্রামে তখনকার দিনে প্রায় সবাই চাষবাষের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। অল্পবিস্তর সবারই জমি-জিরেতও ছিল। কিন্তু বাড়ির ঐ সামান্য জমিটুকা ছাড়া সত্যানন্দবাবুদের এক ছটাকও জমি ছিল না। তিনি কোর্টের এক উকিলের মুহুরি ছিলেন। সেই নাম যশহীন উকিলের মুহুরি হওয়ার জন্য সত্যানন্দবাবুর আয়ও খুব সামান্যই ছিল। ফলে অভাবের সংসার। কিন্তু লেখাপড়ার দিকে ঝোঁক থাকার জন্য ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর প্রবল চেষ্টা করেছেন। বড়ো ছেলের বোধ হয় মাথাও ভালো ছিল। পটাপট পাশ করে চাকরির পরীক্ষা দিয়ে ভালো চাকরি বাগিয়ে সবার আগে বাড়ি ছেড়ে পালায়। মেয়েগুলোও লেখাপড়ার সঙ্গে নাচ-গান শিখে পাড়া মাতিয়ে রাখে। ছোটো ছেলেও চলনসই লেখাপড়া শিখে যথা সময়ে মিলিটারিতে চলে যায়। কিন্তু নিরেট এই মেজটি। ছোটো থেকে প্রত্যেক ক্লাসে ভিত মজবুত করতে করতে উঠে। অনেক চেষ্টা করেও স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষায় বসানো যায়নি। হিদেকে উতরে দিল হিদের কাকা—কোলকাতার কাকা। তিনি যে কোনও কারণেই হোক তাঁর ঐ দাদার প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বছরে অনন্ত তিন চারবার আসতেন—আর তখন ঐ সংসারে আনন্দের জোয়ার বয়ে যেত। বড়ো মাছ কিনে আনতেন, অনেক বাজার করতেন। যে বাড়িতে অন্য সময় ভাতের ফ্যানে সবটুকু ভিটামিন থাকার জন্য এতটুকুও ফেলা হত না সেটাই ছিল বাড়ির সবার জলখাবার। কিন্তু কোলকাতার কাকা এলে জল খাবার হত লুচি আর হালুয়া দিয়ে। সঙ্গে রসগোল্লা। হিদের বন্ধুদের জন্যও বরাদ্দ ছিল চকোলেট—যা কিনা গ্রামের কোনও দোকানে তখন কিনতে পাওয়া

যেত না। আর উপরি পাওনা ছিল কোলকাতার গল্প—গড়ের মাঠের কথা— ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান। হিদের কাকার ছেলেদের কাছে চুনী গোস্বামী, পি. কে., বলরামদের খেলার গল্প শুনে পাড়ার ছেলেরা ধন্য হয়ে যেত। রেডিওতে খেলার রিলে তাও ঐ হিদেদের বাড়িতেই শোনা যেত। গ্রামে আর কারও রেডিও ছিল না। হিদের কোলকাতার কাকা তার দাদাকে ঐ রেডিওটা উপহার দিয়েছিল। কোনও ২৫শে বৈশাখ কলকাতার কাকা গ্রামে হাজির থাকলে তার ছেলেমেয়ে আর হিদের বোনেরা মিলে রবীন্দ্রজয়ন্তী হতই। হিদেকে যখন কোনো ক্রমেই স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ানো গেল না তখন তার বাবা ছেলেকে নিয়ে কোর্টে যাতায়াত শুরু করলেন। কিন্তু সেখানেও সুবিধা হল না। একদিন তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল কাকার সঙ্গে কোলকাতায়। গ্রামের বন্ধুরা তখন শোকে মুহ্যমান। হিদে পড়াশুনার মতো কোনও খেলাতেই ভালো ছিল না। কিন্তু সব খেলাতেই সে ছিল সবচেয়ে উৎসাহী। কে যেন বলেছিল নন-প্লেয়িং ক্যাপটেন। নিজেও বলে খুব আনন্দ পেত। তাই তার অনুপস্থিতিতে গ্রামের ছেলেদের খেলাধূলাতেই ভাটা পড়ে গেল। রবীন্দ্রজয়ন্তীও বন্ধ হল। তার পর একদিন হিদে ফিরে এল, একই রকম হাসি খুশি। আরও যেন গর্বিত-দৃপ্ত। হিদে এখন চাকরি করে লালবাজারে। হিদে হয়ে গেল ডেইলি প্যাসেঞ্জার। রবিবারে খেলার মাঠ। পুরোনো বন্ধুরা খেলার মাঠ ছেড়েছে। ছোটোরা পেল তাদের উৎসাহী হিদেদাকে। হিদে পেল আরেক নতুন জগৎ ট্রেন-ট্রেনের ডেইলি প্যাসেঞ্জার। সবার আগে স্টেশনে যায়। সবার জন্য জায়গা রাখে। আগে শুধু নিজের কম্পার্টমেন্টের দায়িত্ব ছিল পরে পাশের কম্পার্টমেন্টের জায়গা রাখার দায়ও হিদের। কিন্তু হিদের কোনও সিট নেই। জানলার ধারে 'বড়দার' সিট। তারপর বিভিন্ন দাদার। হিদের কখনও চতুর্থ সিট কখনও বা দাঁড়ানো। তাস খেলাতেও হিদে দর্শক। তাতেই হিদের আনন্দ। জল এনে দেয় হিদে। চা এনে দেয় হিদে। চপ কাট্‌লেট আরও যার যা দরকার। হুকুম তামিল করেই হিদে ধন্য। আর সবার মুখে শুনে শুনে হিদে জেনে গেছে সে খুব মান্যগণ্য-লালবাজারের স্টাফ। সবাই জানে অফিসের পিওন। কিন্তু সবাই হিদের গর্বের বেলুন ফুলিয়ে আনন্দ পায়— তাই সবাই বলে "তুই হলি লালবাজারের স্টাফ। তুই কাউকে কেয়ার করবি না"। হিদে কাউকে কেয়ারও করত না। লালবাজারের স্টাফ হয়ে আর ট্রেনের বড়দার ভাই হয়ে হিদের নতুন জীবন ভালোই চলছিল। মাইনা পেয়ে সব টাকা তখন বৃদ্ধ-অক্ষম বাবার হাতে তুলে দিত-আর সকালে বৃদ্ধা মায়ের তৈরি টিফিন নিয়ে লালবাজারের স্টাফ রওনা দিত কলকাতায়। অনেক রাতে যখন ফিরে আসত তখনও হাসি খুশি।

কিন্তু কী করে যে অঘটনটা ঘটে গেল। গ্রামে কী একটা নিয়ে ভীষণ গোলমাল শুরু হল। সেই গোলমাল হঠাৎ দুই সম্প্রদায়ের গোলমালে রূপান্তরিত হল। শুধু থানার পুলিশে হল না। রিজার্ভ পুলিশেরও ডাক পড়ল। পুলিশকে গুলিও চালাতে হল। গোলমাল থামল। গ্রামে পুলিশ পাহারা থাকল। গ্রামে অঘোষিত কার্ফু হল। হিদে এগুলো কিছুই জানত না। সকালে বেরিয়ে রাতে যখন গ্রামে পৌঁছোল হিদের রাস্তাঘাট শুনসান মনে হলেও অন্য কিছু মনে হয়নি।

বাড়ির দিকেই এগোতে থাকল। খেয়ালও করেনি কখন পেছনে পুলিশ এসেছে। হঠাৎ শুনল হল্ট। "লালবাজারের স্টাফ" বলে আপন মনে আত্মভোলা আত্মদৃপ্ত হিদে এগিয়ে চলল। অ-বাঙালি পুলিশের পছন্দ হল না ঐ দৃপ্ত পদক্ষেপ। গর্জে উঠল রাইফেল। একটা নয় পর পর তিনটে গুলি চালিয়ে দিল। লুটিয়ে পড়ল হিদে - চিৎকার করে 'মা'....। উৎকণ্ঠিত বৃদ্ধা মা ছেলের অপেক্ষাতেই বাড়িতে ছিল। "মা..." ডাক ঠিক তাঁর কানেও পৌঁছোল। "হিদে আমার হিদে..." "বৃদ্ধার বুকফাটা চিৎকারে নিস্তব্ধ গোটা গ্রাম মুহূর্তে বাঁধ ভাঙা হয়ে বেরিয়ে পড়ল। পুলিশি শাসন ভেঙে গেল, ভেঙে গেল দিনের বেলার সাম্প্রদায়িক বিভেদ। হতবাক অন্য পুলিশও। গ্রামের মানুষ পুলিশ এক হয়ে মুহূর্তে পুলিশের গাড়িতেই নিয়ে চলল হিদেকে হাসপাতালে। কাতারে কাতারে মানুষ একে একে হাজির হল। হিদে তখনও বেঁচে আছে। সার্জেন নিয়ে গেলেন ও.টি.তে। রক্ত লাগবে। লাইনে দাঁড়িয়ে গেল সবাই—দিনের বেলায় যারা মারামারি করছিল তারাও। ডাক্তারবাবু যা রক্ত চেয়েছিলেন তার তিন গুণ রক্ত জমা হয়ে গেল ব্লাড ব্যাঙ্কে যদি লাগে। সারা রাত ধরে যমে মানুষে টানাটানি চলে। পুবের আকাশ যখন লাল হয়ে উঠেছে— হিদে তখন চলে গেল। হাসপাতালে তখন কয়েকশো মানুষ সারা রাত জেগেছে। সঙ্গে সেই পুলিশগুলোও। তারাও রক্ত দিয়েছে। বারবার ছুটে গিয়ে ঔষধ এনেছে। তাদের চোখেও জল। পুলিশ আর মানুষ একাকার। এর মধ্যে কে যেন স্টেশনে খবর দিয়ে এসেছে। একটু পরে হাজির হয়ে গেল এক ট্রেন মানুষ ডেইলি প্যাসেঞ্জার—যারা নিজেদের ডেইলি পাষণ্ড বলে। সবার সেদিন অফিস বন্ধ। তারপর অনেক পর্ব পেরিয়ে পোস্টমর্টেম হয়ে সেই শোকস্তব্ধ মানুষ পেল তাদের প্রিয় হিদেকে । ঐ এলাকার মানুষ কোনও দিন এমন মিছিল দেখেনি। রাজনৈতিক কারণেও এত বড়ো মিছিল হয়নি। যে কারণে আগের দিনে গ্রামে গুলি চল্‌ল হিদের শোকে ভেসে গেল সব হানাহানি ভুল বোঝাবুঝি। প্রাণ দিয়ে ফিরিয়ে আনল শান্তি— ও যে হৃদয়ানন্দ।

ভোরের আলো

তাঁর নিস্তরঙ্গ জীবনে এরকম চমকের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। অনিরুদ্ধ প্রথম কয়েক বছর এক বে-সরকারি সংস্থা ও এখন শিক্ষকতা পেশা হিসেবে কোনওটা যেমন অপছন্দের নয় আবার এই পেশা নিয়ে আপ্লুতও নয় অনিরুদ্ধ। পেশা জীবন ধারণের একটা অঙ্গ। যার পেশা থেকে প্রাপ্ত অর্থ জীবন ধারণের জন্য পর্যাপ্তই মনে হয় তার। সামনে শখ-সৌখিনতার কোনও চাহিদাই অনুভূত হয় না অনিরুদ্ধের জীবনে।

জীবনে কখনও কিছু প্রত্যাশা ছিল কিনা—হৃদয় খুরে বেদনা জাগানোর ইচ্ছাটাও হয়তো মারা গেছিল। তাই আজকে চমক শুধু চমক নয়- হঠাৎ যেন নিজেকে ফিরে দেখা, নিজেকে ফিরে পাওয়া অথবা হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার খুলে যাওয়ার পর সযত্নে লালিত নিজস্ব সত্তাকে আবিষ্কার।

গত ছ'বছর ধরে এই দিন সকালে বিমলকাকুর বাড়িতে উপস্থিত হওয়া যেন অনিরুদ্ধর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। ছ'বছর আগে এই দিন বিমলকাকু অর্থাৎ বিমলরঞ্জন চক্রবর্তী ইহলোক ত্যাগ করেন। বিমলবাবু মফস্‌সলের এই ছোটো শহরে কবি হিসেবে ভালোই পরিচিত ছিলেন। বিমলবাবুর নিজস্ব কোনও পেশা ছিল না। আসলে পেশার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। পূর্বপুরুষের সঞ্চিত সম্পদ শুধু বিমলবাবু কেন পর অধঃস্তন আরও কয়েক পুরুষ বিনা পেশায় কাটিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্টই ছিল। বিমলবাবুর পূর্বপুরুষদের নানা রকম বদ নেশা থাকলেও বিমলবাবুর কিন্তু একমাত্র নেশা হয়ে দাঁড়াল 'সাহিত্য চর্চার' নেশা। বাড়িতে নির্দিষ্ট দিনে সাহিত্য চর্চার আসর বসত। আর বছরে অন্তত একবার কোলকাতা থেকে নামী-দামি কবি-সাহিত্যিকদের এনে এই মফস্‌সলের শহরে সাহিত্য চর্চার আসর বসাতেন বিমলবাবু। এরকমই এক আসরে প্রথম এসেছিল অনিরুদ্ধ, হৈমন্তীর সাথে। হৈমন্তী আলাপ করিয়ে দিয়েছিল, 'বাবা, এ অনি- অনিরুদ্ধ আমাদের কলেজের সেরা কবি'। বিমলবাবু সেদিন থেকে অনিরুদ্ধের বিমলকাকু বলেছিলেন 'জানো তো- আমি সেই প্রবাদে বিশ্বাস করি— যে কবিতা ভালবাসে তাকে আমিও ভালোবাসি।' আজীবন বিমলবাবু সেই কথা রেখেছেন আর বিমলবাবুর মৃত্যুর পরও সেই কথা রেখে চলেছে অনিরুদ্ধ। হৈমন্তীর সঙ্গে বিবাদও সে কবিতা নিয়েই। বিমলবাবুর মৃত্যুর পর থেকেই তাগাদা দিয়ে আসছে তার প্রিয় বিমলকাকুর সব কবিতাগুলো এক সঙ্গে পেতে যাতে একটা কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ করা সম্ভব হয়। আর এজন্য ঠিকও করে রেখেছে প্রভিডেন্ড ফান্ডে জমা টাকা থেকে সে খরচ করবে এর প্রকাশনার জন্য। আর ছ'বছর পার হতে চলল আজও হৈমন্তী গুছিয়ে উঠতে পারল না বাবার কবিতাগুলো। আর ছেলে সুপ্রকাশ ভালো ছাত্র, তাকে বলে তো কোনও লাভই নেই, বাবার মৃত্যুর পর বার দুয়েক এই বাড়িতে এলেও তার অবস্থান ছিল মাত্র ঘন্টা কয়েক। কর্পোরেট দুনিয়ায় আজ তার মস্ত নাম। আজ এ কোম্পানি কাল ও কোম্পানি ম্যানেজমেন্টে পারদর্শী সুপ্রকাশ— বাবার কবিতাগুচ্ছ প্রকাশনার এই সামান্য

ম্যানেজমেন্ট সেও দিদির হাতে ছেড়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত। আর দিদি সে কী করে এত উদাসীন থাকতে পারে অনেক ভেবেছে অনিরুদ্ধ। এক সময় সেও তো ভালো ছাত্রী ছিল। সাহিত্যের ছাত্রী ইংরাজি সাহিত্যের, কবিতা লিখেছে ইংরাজি-বাংলায়।

সেই কবিতার জন্যই কাছে এসেছে অনিরুদ্ধ-হৈমন্তী। এই মফস্‌সল শহর থেকে জেলা শহরে নামী কলেজে ইংরাজি অনার্স পড়তে গেছিল হৈমন্তী আর অখ্যাত এক গ্রাম থেকে অনিরুদ্ধ। হৈমন্তী প্রথম অনিরুদ্ধকে চিনেছিল যেদিন ইংরাজির প্রধান অধ্যাপক মুগ্ধ হয়ে গোটা ক্লাসের সঙ্গে অনিরুদ্ধকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। অনার্সের যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষায় প্রথম হওয়ায়, বলেছিলেন পরিচয় করানো হল শুধু প্রথম হওয়ার জন্য নয় স্বকীয়তার জন্য। তাঁর আশা ছিল অনিরুদ্ধ একদিন অধ্যাপনা জগতে আসবে, ভাস্বর হবে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য। কিন্তু অনার্সের পর আর পড়াই হল না অনিরুদ্ধের। তবে কিছুদিন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাটালেও শেষে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে স্কুলেই— পেয়েছে শিক্ষকতার জীবন।

আর কেউ বাড়িতে এলে ফেরায় না যতদূর সম্ভব পড়ায় সাহায্য করে। অনার্সের ছাত্ররাও আসে, শিক্ষকতার এ জীবন নিয়ে এক পরম পরিতৃপ্তি অনুভব করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার প্রথম প্রেম ও শেষ আশ্রয় কবিতাই। বিকেলে স্কুল থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরে রাতের গভীরে। এ সময় তার গন্তব্য জেলার বিভিন্ন কবিতার আড্ডায়। কোনও কোনও দিন কোলকাতাতেও। বাড়ি ফেরার তো কোনও তাড়া নেই অকৃতদার অনিরুদ্ধের।

আর হৈমন্তী, ক্লাসে ঐ একবারই প্রথম হয়েছিল অনিরুদ্ধ—তার পরে নোটসর্বস্ব-সাজেশান ভিত্তিক সব পরীক্ষাতেই ক্লাসের সেরা ছিল হৈমন্তী। এমনকি সে বছর জেলার মধ্যে ইংরাজি সাহিত্যে একমাত্র প্রথম শ্রেণি হৈমন্তী। আর অনিরুদ্ধ কোনও রকমে দ্বিতীয় শ্রেণি পেয়ে ইউনিভার্সিটি পড়ায় ইতি টেনেছিল। অবশ্য ভালো নম্বর পেলেও কোলকাতায় গিয়ে পড়া সম্ভব ছিল না। অখ্যাত গ্রামের কুঁড়ে ঘর থেকে জেলা শহরে পিতৃহীন অনিরুদ্ধের পড়া সম্ভব হলেও কলকাতায় পড়া অসম্ভব ছিল। অখ্যাত গ্রামের ঐ কুঁড়েঘরে অনেকবার গেছে হৈমন্তী। অনিরুদ্ধের মা আর বোনের ছোট্ট সংসারে বড়োলোকের খেয়ালি মেয়ে কিন্তু সহজেই আপন জন হয়েছে। অনিরুদ্ধের মায়ের স্নেহ আর ছোটো বোন রুমকির ভালোবাসা তৃপ্তি ভরে আস্বাদন করেছে। প্রথম আলাপের কিছুদিন পর থেকেই রুমকি তাকে 'বৌদি' বলে ডেকেছে-প্রশ্রয়ও দিয়েছে হৈমন্তী। অনিরুদ্ধের মাও কিছুদিন পর থেকে বিশ্বাস করেছে কোনও হেমন্তের বিকেলে ঘর আলো করে বড়োলোকের এই মেয়ে তার পুত্রবধূ হবে। কিন্তু কোলকাতায় পড়তে যাওয়ার পর থেকে অনিরুদ্ধের সাথে মেলামেশায় ভাটার টান পড়ে। মাঝে মাঝে এলেও এক সময় আসা যাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

অনিরুদ্ধও তখন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল অন্য জগতে। নিয়ম করে বিমলকাকুর সাহিত্য বাসরে উপস্থিত হলেও হৈমন্তীর সঙ্গে আর দেখা হয় না। হৈমন্তী তখন অন্য জগতে কবিতা থেকে সাহিত্য থেকে অনেক দূরে— যদিও তখনও কোলকাতা